বাংলাদেশে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আইন ও বিধিবিধান সংস্কার: বর্তমান ক্ষতি এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ

ড. সালওয়া হক

পোস্টডক্টরাল রিসার্চ ফেলো | AIAI নেটওয়ার্ক, এমোরি বিশ্ববিদ্যালয়

ভিজিটিং ফেলো | ইনফরমেশন সোসাইটি প্রজেক্ট, ইয়েল ল স্কুল

অনুবাদ করেছেনঃ এডভোকেট ইসরাত জাহান সিদ্দিকী

ক্রমপরিবর্তনশীল প্রযুক্তিগুলোর সাথে সামঞ্জস্য আনার জন্য কিভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আইন ও বিধিবিধান অন্তর্ভুক্ত করা যায় সে বিষয়ে বাংলাদেশও অন্যান্য অনেক দেশের মতো চিন্তাভাবনা করছে। শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত, আমরা প্রায় সবাই বিভিন্নভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাথে যুক্ত, হোক সেটি আমাদের স্মার্টফোন ব্যবহার করার সময়, অথবা ইন্টারনেটে কোনকিছু খোঁজার সময়, অথবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে যুক্ত হওয়ার সময়। বেশিরভাগ পরিবারে অন্তত একজন সদস্য (এবং সাধারণত আরও বেশি) এই প্রযুক্তিগুলোর সাথে যুক্ত আছে, এবং এখনই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে আইন ও বিধিবিধান প্রয়োজন তা নিয়ে সামগ্রিকভাবে চিন্তা করার উপযুক্ত সময়।

বাংলাদেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ ২০২৪ সালে জাতীয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নীতি ২০২৪ নামে একটি খসড়া তৈরি করেছে। এই খসড়া আইনের উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে যে বাংলদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক অগ্রগতি এবং জাতীয় নিরাপত্তার জন্য এই আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে "২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ অর্জনের পথে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নৈতিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা"। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নীতি খসড়াটি তথ্যভিত্তিক নীতির সমর্থন ও প্রচার করে, কিন্তু একইসাথে এটি প্রশ্ন তোলার সময় - আদৌ কি তথ্যভিত্তিক নীতি সমাজের কল্যাণে অবদান রাখে? সমাজে একটি প্রচলিত ধারণা রয়েছে যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা তৈরিকৃত ফলাফলগুলি মানুষের তুলনায় "ভালো" কারণ এগুলো ১) সামগ্রিক (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা খুব দ্রুত বড় তথ্যভান্ডার বিশ্লেষণ করতে পারে যেভাবে মানুষ করতে পারে না) ২) নিরপেক্ষ (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের মতো পক্ষপাতদুষ্ট নয়, অর্থাৎ, ফলাফলগুলি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক প্রণোদনার ভিত্তিতে নয়)। যদিও অ্যালগরিদমগুলি মানুষের মতো পক্ষপাতদুষ্ট নয়, তবুও এই প্রযুক্তিগুলোতে নকশাকারদের ব্যাক্তিগত মূল্যবোধ অন্তর্ভুক্ত থাকে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থাগুলো ব্যবহার করার অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যা আমাদের সামগ্রিকভাবে আলোচনা করা উচিত যেন আমাদের জনগণ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থার কারণে, অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও, ক্ষতির শিকার না হয়।

এই প্রবন্ধে আমি বর্তমান কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নীতি খসড়ার সীমাবদ্ধতাগুলো তুলে ধরেছি। এই উল্লিখিত খসড়াটি যদি বাতিলও করা হয়, এই লেখায় উল্লিখিত বিষয়গুলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আরও ব্যাপকভাবে চিন্তাভাবনার জন্য অবদান রাখতে পারে। আমি ২০২১ সাল থেকে উপাত্ত সুরক্ষা আইনের বিভিন্ন খসড়া পর্যালোচনা করছি এবং তখন থেকে একাডেমিক, এনজিও গবেষক, নীতি-নির্ধারক এবং সাংবাদিকদের সাথে বিভিন্ন পাবলিক সেমিনার এবং অভ্যন্তরীণ আলোচনায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কিত এই লেখায় উল্লিখিত বিভিন্ন উদ্বেগের বিষয়ে আলোচনা করেছি। এই লেখাটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থাগুলোকে অনিয়ন্ত্রিত রাখার ফলে যেসব উদ্বেগের সৃষ্টি হতে পারে তার একটি সংকলন।

যদি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নীতি বাস্তবায়িত হয়, এটি ডিজিটাল মিডিয়া এবং প্রযুক্তিকে নিয়ন্ত্রণকারী বিদ্যমান আইনগুলোর সাথে, যেমন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, একটি নতুন সংযোজন হবে। সাম্প্রতিক সময়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন পরিবর্তিত হয়ে সাইবার নিরাপত্তা আইনে পরিণত হয়েছে। প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণকারী নীতিগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসাধারণের নিরাপত্তা, গোপনীয়তা এবং অধিকার সংরক্ষণ করা এবং একইসাথে এটিও নিশ্চিত করা যেন কেউ কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্র দ্বারা শোষণ, বৈষম্য বা ক্ষতির শিকার না হয়। তবুও, বাংলাদেশের সাংবাদিক, সংখ্যালঘু অধিকার কর্মী, আইনজীবী, নারীবাদী, মানবাধিকার কর্মী এবং একাডেমিকরা জানিয়েছেন যে কিভাবে ডিজিটাল আইনগুলি রাষ্ট্র এবং সমাজের প্রভাবশালী সদস্যদের দ্বারা জনসাধারণকে ভয় দেখানোর এবং তাদের চুপ রাখার জন্য, বিশেষ করে সমাজের প্রান্তিকদের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে ব্যবহৃত হয়।

আগস্ট ২০২৪ সালে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হন এবং সংসদ ভেঙে দেয়া হয়। এর ফলে বাংলাদেশ পরিবর্তিত অবস্থায় প্রবেশ করে যেখানে পরবর্তী সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হয়। এটি বিদ্যমান ডিজিটাল আইনগুলো, যেগুলো স্বৈরশাসনের সহায়ক ছিল, সেগুলো সংস্কার করার এবং বাস্তবায়নের পূর্বে খসড়া আইনগুলি পুনর্বিবেচনা করার একটি সুযোগ তৈরি করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ফোরাম ফর ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশন বাংলাদেশ (FExB) ইতোমধ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে সাইবার নিরাপত্তা আইন বাতিলের অনুরোধ জানিয়েছে কারণ এই আইনের প্রণয়ন প্রক্রিয়া প্রশ্নবিদ্ধ। এই আইনটি মানুষকে সহায়তা করার পরিবর্তে রাষ্ট্র কর্তৃক সরকারের সমালোচনা করা ব্যক্তিদের উপর দমনপীড়ন করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছিল।

এই লেখাটি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন (এবং পরবর্তী) সরকারের পাশাপাশি এই অঞ্চলের জনগণের প্রতি একটি আহবান জানায় যেন তারা বর্তমান কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নীতি খসড়ার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হন। এই লেখার উদ্দেশ্য হলো পারস্পরিক সংলাপ উত্সাহিত করা এবং একইসঙ্গে এমন আইন তৈরিতে কাজ করা যা জনগণের কল্যাণ এবং সুরক্ষা নিশ্চিতের পাশাপাশি প্রান্তিক এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করবে।

বৈষম্যমূলক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উদাহরণ

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নীতি খসড়ায় দাবি করা হয়েছে যে "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থা জনসেবা কার্যকারিতা বৃদ্ধি করবে, ব্যক্তিগত সেবা প্রদান নিশ্চিত করবে, স্বয়ংক্রিয় এবং অনুমানমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নাগরিক-বান্ধব সেবাগুলি উন্নত করবে" (ধারা ৪.১)। যদিও খসড়া আইনটি স্বয়ংক্রিয়তা এবং অনুমানমূলক প্রক্রিয়ার ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করেছে, সেখানে AI দ্বারা নেওয়া সিদ্ধান্তগুলোর কারণে ব্যক্তিদের এবং সম্প্রদায়গুলির সুরক্ষার বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই যা তাদের ক্ষতি করতে পারে। বর্তমানে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যদিও অধিকাংশ সিদ্ধান্ত এখনও স্বায়ত্তশাসিত নয়, তবুও এগুলি বিভিন্ন বিষয়ে প্রাথমিক স্ক্যানিং, ফিল্টারিং এবং মূল্যায়নে ভূমিকা পালন করে। নিরপেক্ষ হওয়ার পরিবর্তে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থা আধিপত্যকারী পক্ষপাতকে শক্তিশালী করতে পারে।

এখানে আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে নেওয়া একটি উদাহরণ দেখতে পারি যা বাংলাদেশে প্রতিরোধ করা যেতে পারে - অ্যামাজন তাদের নিয়োগ পদ্ধতিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) টুল ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছে কারণ এটি নারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে বৈষম্য করছিল। এর কারণ হলো, এই মডেলটি যে প্রশিক্ষণ উপাত্ত ব্যবহার করে তৈরি হয়েছিল তা সংগ্রহ করা হয় বিগত দশ বছরে এই কোম্পানিতে প্রেরিত সিভিগুলো থেকে। যেহেতু সামাজিক ও লিঙ্গগত বৈষম্যের কারণে অতীতে বেশিরভাগ চাকরির আবেদনকারী পুরুষ ছিলেন, এর ফলে স্বয়ংক্রিয় ফিল্টারিং পদ্ধতিটি পুরুষদেরকে নারীদের উপর অগ্রাধিকার দিচ্ছিল। এই ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহারকারী নিয়োগকর্তাদের কাছে যে তালিকা প্রদান করা হতো তাতে হয়তো নারী প্রার্থীদের সংখ্যা খুবই কম হতো অথবা একজনও নারী প্রার্থীরা সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকতো না। উত্তর আমেরিকায়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থা প্রায়ই জাতি বিশেষে বৈষম্য করে, বিশেষ করে অশ্বেতাঙ্গ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং অভিবাসীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য করে (ওয়েন্ডি চুনের "ডিসক্রিমিনেটিং ডেটা" এবং কেট ক্রফোর্ডের "এটলাস অব এআই" দেখুন)। অর্থাৎ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা তৈরিকৃত ফলাফলগুলি নিরপেক্ষ নয়, কারণ সেগুলো পূর্ববর্তী অফলাইন পক্ষপাতগুলোকে শক্তিশালী করতে পারে।

আমি নিয়োগের উদাহরণ ব্যবহার করছি কারণ এআই (প্রবন্ধের পরবর্তী পর্যায়ে 'AI' হিসেবে উল্লিখিত) নীতির খসড়াটি AI নিয়োগ ব্যবস্থায় সাহায্য করতে পারে; ধারা ৪.৮.৫-এ বলা হয়েছে, "AI ব্যবস্থা উন্নত অ্যালগরিদম ও ডেটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সুযোগগুলিকে তরান্বিত করবে।" এই আইনগুলি প্রায়ই অস্পষ্টভাবে ও অনিশ্চিতভাবে লেখা হয়, যা বৈষম্যের শিকার ব্যক্তিদের অসুরক্ষিত থাকা অবস্থায় নিয়োগকর্তাদেরকে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়। বাংলাদেশে (এমনকি বিশ্বের বেশিরভাগ স্থানে) নারীদের এখনও কর্মসংস্থান পেতে পুরুষদের তুলনায় কঠিন সময় পার করতে হয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের ফলে এই বৈসাদৃশ্য আরও বাড়বে। ফিল্টারিং মডেলগুলো সাধারণত নামের প্যাটার্ন (প্রধানত সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠী) গ্রহণ করতে পারে যা কোন সিভিগুলো সংক্ষিপ্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে তা প্রভাবিত করে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, এটি অমুসলিম সংখ্যালঘুদের (অমুসলিম নাম নিয়ে) জন্য এই ধরনের মডেলের দ্বারা সংক্ষিপ্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে আরও কঠিন করে তুলতে পারে। তাই, আমাদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আইনগুলোতে এই ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার উপায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, যা প্রান্তিক সম্প্রদায়গুলোকে আরও ক্ষতির সম্মুখীন করার প্রবণতা রাখে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক আরেকটি উদাহরণ হল বিবাহ/বিচ্ছেদ সম্পর্কিত মামলাগুলির ক্ষেত্রে AI ব্যবহার করা। বর্তমানে আইনজীবী এবং প্রযুক্তি কোম্পানির প্রতিনিধিরা বলেন যে নতুন প্রযুক্তিগুলো বিভিন্নভাবে আইনজীবী এবং বিচারকদের সহায়তা করতে পারে, যেমন মামলার যথাযথ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য বিদ্যমান উপাত্ত ব্যবহার করা। উদাহরণস্বরূপ, AI ব্যাবহারের মাধ্যমে একটি দম্পতির বিবাহবিচ্ছেদ পরবর্তী ভরণপোষণ নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হতে পারে, যা ফ্রান্সে অধ্যয়নকৃত ফ্যাব্রিস মুলহেনবাখ এবং তার গবেষক দল অনুসন্ধান করেছে। এটি বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ এশিয়াতে বেশকিছু সমস্যার সৃষ্টি করবে। প্রথমত, অনেক বিবাহ ও বিচ্ছেদ (বিশেষত গ্রামীণ বাংলাদেশে) রাষ্ট্রের কাছে নিবন্ধিত নয়। এই ক্ষেত্রে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থাগুলোর কাছে এই বিবাহগুলোর কোনো তথ্য নেই, যা ডিজিটাল না হওয়া বিবাহগুলোর অস্তিত্বহীনতা নির্দেশ করে। বাংলাদেশের অনেক প্রান্তিক এবং আদিবাসী সম্প্রদায় রয়েছে যেখানে দম্পতিরা সামাজিক রীতি অনুযায়ী বিবাহ সম্পন্ন করেন এবং রাষ্ট্রের কাছে তাদের বিবাহ আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধন করেন না। এছাড়াও, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মতো সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলির জন্য জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এবং বিচ্ছেদ রাষ্ট্রের কাছে নিবন্ধন করতে অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। যদি বিবাহ/বিচ্ছেদ উদ্দেশ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থা ব্যবহার করা হয়, তবে সেগুলি ইতোমধ্যে বিদ্যমান ডিজিটাল উপাত্ত, যেমন বিদ্যমান বিবাহ নিবন্ধনের উপর নির্ভর করবে, যা অনেক সংখ্যালঘু এবং আদিবাসী সম্প্রদায় এবং তাদের প্রচলনকে বাদ দেবে।

দ্বিতীয়ত, মুসলিম দম্পতিদের জন্য বিবাহবিচ্ছেদ পরবর্তী ভরণপোষণ একটি খুবই জটিল বিষয়। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট নারীদের ভরণপোষণের অধিকার প্রদানের জন্য বিভিন্ন উপায়ে সূরা আল-বাকারার আয়াত ২৪১ ব্যবহার করেছে। এই আয়াতে কোনো "নির্ধারিত পরিমাণ" উল্লেখ নেই, এবং এক্ষেত্রে আইনগত ব্যাখ্যা ও আদালতের নমনীয়তার প্রয়োজন পরে। এই নমনীয়তা নারীদের, বিশেষত প্রান্তিক সম্প্রদায়ের নারীদের জন্য, যদি সামাজিক

নিয়ম এবং ক্ষমতার কাঠামো তাদের বিরুদ্ধে থাকে তবুও, ক্ষতিপূরণ এবং ভরণপোষণের অধিকার পাওয়ার সুযোগ করে দেয়। এই নমনীয়তা এবং আইনগত ব্যাখার এই ধরনের সুযোগ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা এত সহজে পুনরাবৃত্তি করা সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত, বাংলাদেশের মুসলিম বিবাহগুলোতে দেনমোহর রয়েছে, যা একজন স্বামী কর্তৃক বিয়ের সময় তার স্ত্রীকে প্রদানের জন্য বাধ্যতামূলক অর্থ। বাস্তবে, স্বামীরা বিবাহের সময় এই টাকা পরিশোধ করেন না, ফলে পুরো বা আংশিক পরিমাণ "বাকি" হিসাবে কাবিননামা/নিকাহনামায় থাকে। বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে, স্বামী "বাকি" টাকা পুরোপুরি পরিশোধ করতে বাধ্য থাকে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই ধরনের বিষয় জটিল আলোচনার সম্মুখীন হয়। আমার নৃতাত্ত্বিক গবেষণা নির্দেশ করে যে গ্রামীণ বাংলাদেশের নারীরা প্রায়শই বিবাহবিচ্ছেদের সময় তাদের স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের সাথে আলোচনা করার জন্য "বাকি" পরিমাণ ব্যবহার করেন। একটি পিতৃতান্ত্রিক সমাজে, এই সামান্য আলোচনা নারীদের জন্য তাদের কিছু দাবি পূরণের চেষ্টা করার একটি ছোট সুযোগ প্রদান করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে স্বামী বা তার পরিবার কাবিননামায় উল্লেখ করেন যে পুরো দেন মেহর পরিমাণ পরিশোধ করা হয়েছে যদিও বাস্তবে তা আসলে হয়না। এসকল ক্ষেত্রে নারীরা দেনমোহরের টাকা পাওয়ার জন্য পরিবারের এবং তার প্রতিবেশীদের স্মৃতির উপর নির্ভর করে থাকেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মডেলগুলি কাঠামোবদ্ধ তথ্যের উপর নির্ভর করে, যা কোডিফায়েড করা হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা জানি, বাস্তবতা কাঠামোবদ্ধ নয়। লিঙ্গভিত্তিক এবং আধিপত্যকারী ক্ষমতার কাঠামোর মধ্যে নিহিত এই জটিল পরিস্থিতিগুলি মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজন প্রাসঙ্গিক উপলব্ধি যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থায় সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। বিবাহ এবং বিচ্ছেদের জন্য এই ধরনের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থাগুলি ব্যবহারের ফলে নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ একজন মানুষ এসব পরিস্থিতিকে প্রসঙ্গায়িত করে বিচার করতে পারেন যা AI পারেনা। যে আইনগুলি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে এসব ক্ষেত্রগুলিতে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করার অনুমতি দেয় তা প্রবর্তন করার পূর্বেই আমাদের এই বিষয়গুলো সম্পর্কে চিন্তা শুরু করা দরকার।

আইনব্যবস্থায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার

একটি প্রচলিত ধারণা রয়েছে যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একটি ন্যায্য আইনী ব্যবস্থা প্রদান করবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নীতি খসড়ায় বলা হয়েছে যে বিচার ব্যবস্থাকে সহায়তা করার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহৃত হবে, যেমন "মামলা প্রক্রিয়াকরণ, ট্র্যাকিং, তফসিলভুক্ত করা, আইনগত গবেষণা, নথি বিশ্লেষণ, মামলা ফলাফলের পূর্বানুমান, প্রতিলিপি তৈরি, কার্যবিবরণী অনুবাদ এবং আদালতকে সহায়তা করার জন্য আইনগত সুপারিশ প্রদান" (ধারা ৪.১.৫)। আইন ব্যবস্থায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা রয়েছে যা আমি আমার নিজস্ব গবেষণার ওপর ভিত্তি করে আমার মতামত তুলে ধরছি। আমার পিএইচডি প্রবন্ধ – "ডিজিটাইজিং ল : লিগ্যাল প্লুরালিজম" – তে আমি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা যাচাই করেছি (বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে) এবং আমার গবেষণার কিছু ফলাফল এখানে তুলে ধরছি।

অনুবাদের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবহার করা একটি সম্ভাব্য উদ্বেগের বিষয়। অনুবাদ একটি জটিল প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সঠিক তথ্য উদঘাটনের জন্য প্রয়োজন প্রাসঙ্গিকতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি। আইনী বিষয়ের একটি জটিলতা হচ্ছে যে, আইন, অধ্যাদেশ, এবং সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে প্রায়ই "সরাসরি" অনুবাদের পরিবর্তে ব্যাখ্যা এবং নমনীয়তার প্রয়োজন। ২০২১ সালে, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ঘোষণা করে যে তারা ভারতের এক স্টেপ ফাউন্ডেশন-এর তৈরি করা 'আমার ভাষা' সফটওয়্যার ব্যবহার করে ইংরেজি থেকে বাংলায় রায় এবং আদালতের আদেশ অনুবাদ করবে। তত্ত্বগতভাবে এটি ভালো শোনালেও বাস্তবে অনেক সমস্যা তৈরি হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আমি একটি গবেষণায় দেখেছি কিভাবে অনেক সময় সম্মতির সাথে পালিয়ে যাওয়া বিষয়ক মামলাগুলিকে নিম্ন আদালতে "উঠায় নেয়া" বা "তুলে নেয়া" বলা হয়। এমন অনেক মামলা রয়েছে যেখানে একজন নারী সাক্ষ্য দেন যে একজন পুরুষ তাকে "উঠিয়ে নিয়েছে" এবং তাকে বিয়ে করতে বাধ্য করেছে—"ও আমাকে উঠাই নিছে/ তুলি নিছে"। এই বলপ্রয়োগের ভাষা ইঙ্গিত করে যে পুরুষটি তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অপহরণ করেছে। তবে, আরও গভীর নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা যায় যে একজন নারী বিভিন্ন কারনে স্বেচ্ছায় তার সঙ্গীর সঙ্গে পালিয়ে যাওয়াকে বলপ্রয়োগ হিসেবে নামকরণ করতে পারে। বাংলাদেশের অসম যৌনভিত্তিক ক্ষমতার কাঠামোর কারণে, বলপ্রয়োগ হিসেবে এই নামকরণ নারীদের সামাজিক অবজ্ঞা থেকে কিছুটা রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে, কারণ একজন ভালো চরিত্রবান নারী কোনভাবেই আবেগজনিত বা যৌন সম্পর্ক, বিশেষ করে পলায়নের মতো কিছুতে যুক্ত হবে না বলে আশা করা হয়। অনেক সময় বাবা-মা বা অভিভাবকরা অপহরণের মামলা দায়ের করেন, যাতে ঐ নারী যদি তার অপহরণের বিষয়টি অস্বীকারও করে তবুও তাদের মামলার মাধ্যমে তাদের পরিবারে ফিরিয়ে আনা যায় এবং তার সঙ্গীকে ত্যাগ করতে বাধ্য করা যায়।

একজন নারীর সাক্ষ্য অনুবাদ করতে স্বয়ংক্রিয় অনুবাদ ব্যবহার করা জটিল। যেহেতু আমাদের দেশে নারীরা এমন সাংস্কৃতিক পরিবেশে বিচরণ করে যেখানে নারীদের থেকে সমাজ প্রত্যাশা করে সে কী বলবে বা কি বলা উচিত নয়, তাই সঠিক অনুবাদ করতে স্থানীয় ও প্রাসঙ্গিক প্রেক্ষাপট জানা জরুরী। গুগল ট্রান্সলেটের অনুযায়ী "ও আমাকে উঠাই নিছে" এর ফলাফল হল "He picked me up," যা এই ধরনের সাক্ষ্যের জটিলতাকে প্রতিফলিত করে না। তাছাড়া, "উঠায় নেয়া/তুলে নেয়া" ভাষার পূর্ববঙ্গের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে কম প্রচলিত। ভারতে তৈরি বাংলা-ইংরেজি AI অনুবাদ মাধ্যমগুলো পশ্চিমবঙ্গের ভাষার রূপের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে, যা বাংলাদেশের পূর্ববঙ্গের প্রেক্ষাপটে উপযুক্ত নয়। এর ফলে স্বয়ংক্রিয় ফলাফলের ক্ষেত্রে পক্ষপাতদুষ্টতা দেখা দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, দীপ্ত দাস ও অন্যান্য তাদের গবেষণায় বাংলা ভাষার অনুভূতি বিশ্লেষণ করতে দেখিয়েছেন যে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং (যা মানুষের

ভাষার সঙ্গে যুক্ত মেশিন লার্নিং) এর মতো প্রক্রিয়াগুলো কিভাবে পক্ষপাতমূলক হতে পারে এবং প্রায়ই ডিজাইনারদের, বিশেষত প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলোর, দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে।

AI নীতিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে 'মামলার ফলাফল পূর্বানুমান' এর জন্য এবং 'আদালতকে সহায়তা করার জন্য আইনি সুপারিশ প্রদান' এর জন্য AI ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্থাৎ এই খসড়া আইনের আওতায় মামলার রায় নির্ধারণে AI ব্যবহার করা অনুমোদিত (এবং উৎসাহিত)। কিন্তু একটি AI মডেল সঠিকভাবে মামলার রায় নির্ধারণ করতে সক্ষম কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলা জরুরি। একটি AI মডেল তার সিস্টেমের ভেতরে থাকা উপাত্তগুলোর মান অনুযায়ী কাজ করে। অর্থাৎ, যদি ডেটাবেসে সংরক্ষিত ডিজিটাল উপাত্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক না হয়, তাহলে AI সিস্টেমগুলো পক্ষপাতদুষ্ট উপাত্ত থেকে ত্রুটিপূর্ণ ফলাফল তৈরি করতে শিখবে। আমরা এখন ডিজিটাল বাংলাদেশ অর্জন প্রক্রিয়ায় থাকলেও এখনও আমাদের বেশিরভাগ তথ্য ডিজিটাইজড হয়নি, তাই আমাদের ডেটাবেসগুলোতে পূর্ণাঙ্গ তথ্য নেই। আমি একটি পিয়ার-রিভিউড প্রবন্ধ লিখেছি – নিওকলোনিয়াল ডিজিটালিটি: এনালাইজিং ডিজিটাল লিগ্যাল ডেটাবেসেস ইউজিং লিগ্যাল প্লুরালিজম – যেখানে দেখানো হয়েছে যে বাংলাদেশের ডিজিটাল আইনি ডেটাবেসে শুধুমাত্র বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের কিছু সংখ্যক মামলাই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই পক্ষপাতদুষ্ট এবং সীমিত উপাত্ত ব্যবহার করে প্রশিক্ষিত AI মডেলগুলো পক্ষপাতদুষ্ট সিদ্ধান্তই দেবে। আমার প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে যে AI বিচারকরা সম্মতিসূচক পালিয়ে যাওয়ার মামলায় নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আদেশ দিতে পারে। মানবজীবন অত্যন্ত জটিল এবং সহজে একে উপাত্তকেন্দ্রিক করা সম্ভব নয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চলমান খ্যাতির মুখে তাড়াহুড়ো করে আদালতের প্রয়োগের জন্য AI সিস্টেমগুলো যেন আমরা চালু না করি তা সম্ভাব্য অসমতা এবং অন্যায্যতার ঝুঁকি বিবেচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মামলার ফলাফলের পূর্বানুমান করার জন্য AIকে মামলার রায়গুলোর উপর ভিত্তি করে প্রশিক্ষণ দিতে হবে, তাই আমাদের দেখতে হবে এই ডিজিটাল আইনি উপাত্তগুলো কোথায় আছে। বর্তমানে বাংলাদেশের আদালতের রায়গুলোর জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় ডিজিটাল আইনি উপাত্তগুলোর জন্য আইনি গবেষণা সফটওয়্যার, যেমন মানুপাত্রা/বিডি লেক্স (যা ভারতে অবস্থিত) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এতে খুবই কম সংখ্যক বাংলাদেশি মামলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং সেগুলোর প্রায় সবই ইংরেজিতে রয়েছে, বাংলায় নয়। কোন মামলাগুলো ডিজিটাইজ করা হবে তা কে নির্বাচন করে তা স্পষ্ট নয়। একইসাথে বাংলাদেশিরা তাদের মামলাগুলো আইনি গবেষণা সফটওয়্যারের অনলাইন আর্কাইভে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে না (যেগুলো বেশিরভাগই অন্য দেশে তৈরি)। অর্থাৎ যদি অনলাইন ডিজিটাল আদালতের রেকর্ড ব্যবহার করে ফলাফলের পূর্বানুমান করতে অ্যালগরিদমিক মডেল তৈরি করা হয়, তাহলে তা খুবই সীমাবদ্ধ হবে কারণ অনলাইনে কম মামলার উপাত্ত পাওয়া এবং বাংলাদেশি ইস্যু-ভিত্তিক (আইন, প্রযুক্তি-শিল্প ইত্যাদি) বিশেষজ্ঞদের এই প্রযুক্তিগুলো উদ্ভাবনে জড়িত না থাকার ফলে সীমিত ফলাফল পাওয়া যাবে।

এছাড়াও, বর্তমান AI নীতির খসড়া বাংলাদেশি নাগরিকদের তথ্য অন্য দেশের কোম্পানিগুলোর দ্বারা সংগ্রহ ও ব্যবহার করা থেকে সুরক্ষিত করে না। যেহেতু আমরা বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক প্রযুক্তি আমদানি করি, তাই বাংলাদেশের মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় আইন থাকা জরুরি, যাতে তাদের তথ্য স্থানীয় এবং বৈশ্বিক বেসরকারি কোম্পানি ও রাষ্ট্রের দ্বারা অপব্যবহারের হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

বিদেশী AI সিস্টেম আমদানিঃ স্বচ্ছতার প্রশ্নে জটিলতা

AI নীতিতে একাধিকবার স্বচ্ছতার গুরুত্বের বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ব্যবহারের স্বচ্ছতার বিষয়ে। অনুচ্ছেদ ৩.২-এ AI নীতির উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে: "AI সিস্টেম এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া প্রবেশযোগ্য এবং ব্যাখ্যাযোগ্য নিশ্চিত করতে AI সিস্টেমের তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ব্যবহারের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে এর ব্যবহারকারী এবং অন্যান্য অংশীজনদের বোঝার সুযোগ দেয়া যে AI কীভাবে সিদ্ধান্তে পৌঁছায় এবং তাদের চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ তৈরি করা।" এটি একটি প্রশংসনীয় উদ্দ্যোগ, তবে এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য ভালো হওয়া সত্ত্বেও এটি বিভিন্ন সমস্যা তৈরি করতে পারে।

প্রথমত, বেসরকারি কোম্পানিগুলির গোপনীয়তা এবং কপিরাইট বিষয়ক আইন রয়েছে যার ফলে নিয়ন্ত্রকেরা সেই কোম্পানিগুলোর AI সিস্টেমগুলোর উপর নজরদারি করতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। বাংলাদেশি কোম্পানিগুলোর জন্য বহিরাগত নিয়ন্ত্রক এবং ডেটা অডিটর অনুমোদিত হলেও বাস্তবতা হলো, বাংলাদেশে ব্যবহৃত বেশিরভাগ AI সিস্টেম বিদেশী কোম্পানির থেকে নেয়া। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশিরা সাধারণত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য যেমন Google (ইমেইল এবং ইন্টারনেট সার্চের জন্য), অফিস সম্পর্কিত কাজের জন্য Microsoft, এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম যেমন WhatsApp এবং Meta ব্যবহার করে। চীনের প্ল্যাটফর্ম TikTok বাংলাদেশে একটি ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয় অ্যাপ, যার এই অঞ্চলে ৩৭ মিলিয়নেরও বেশি ব্যবহারকারী রয়েছে। বাংলাদেশি নাগরিকদের বেশিরভাগ তথ্য বিদেশী ডেটাসেন্টারে সংরক্ষিত হয়, বাংলাদেশে নয়। এর কারণ হলো, বাংলাদেশী বাজারে আধিপত্যকারী বিদেশী কোম্পানিগুলি হল Google Cloud, Microsoft Azure, IBM Cloud, Oracle, এবং এদের মতো আরও অনেকে, এবং তারা বাংলাদেশী ব্যবহারকারীদের তথ্যের উপর ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণ রাখে।

স্বচ্ছতার নিশ্চিত করার অনেক সুবিধা থাকলেও আরও অনেক বিষয় রয়েছে যা AI-কে "অপ্রত্যাশিত" ফলাফল তৈরি করতে সাহায্য করে, যা হয়তো প্রোগ্রামারদেরও সমর্থিত নয়। এর কারণ হলো, AI কে অনুমান করা যায় না। "নোয়িং অ্যালগরিদমস" বইয়ের একটি অধ্যায়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষক নিক সেভার উল্লেখ করেছেন যে, - "আমরা যদি কোড কীভাবে লেখা হয়েছে তার অভ্যন্তরীণ জ্ঞান ও এর প্রবেশাধিকারও পাই, তবুও কোড অত্যন্ত জটিল এবং সময়ের সাথে অনেক মানুষের দ্বারা লেখা ও আপডেট করা হয়ে থাকে। এ কারণে "অপ্রত্যাশিত" ফলাফলের সঠিক কারণ চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে যায় এবং কোড "ঠিক" করাও কঠিন হয়।" এজন্য স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা ও কোডিং নিরীক্ষা করা অনেক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ হতে পারে। তবে এর মানে এই নয় যে এই প্রযুক্তি উন্নয়ন, প্রচার, এবং বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের তৈরি পণ্যের ক্ষতির জন্য জবাবদিহিতা থেকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত। ইউরোপীয় ইউনিয়নের AI আইনটির মতো, বাংলাদেশের AI নীতির জন্যও AI প্রযুক্তি নির্মাতাদের পাশাপাশি যেসব খাত বা ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তিগুলি ব্যবহার করা হয় তাদেরও জবাবদিহিতার আওতায় আনা গুরুত্বপূর্ণ।

AI এবং পরিবেশগত ক্ষতি

প্রযুক্তি কোম্পানিগুলি প্রায়ই প্রচার করে থাতে যে AI বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি কমাতে সাহায্য করে। এর উদাহরণ হিসেবে প্রায়ই ক্লাউড প্রযুক্তির কথা বলা হয়। যখন আমরা ডেটা ক্লাউডে সংরক্ষণ করি, সেই ডেটা কোথায় যায়? "এ প্রিহিস্টরি অফ দ্য ক্লাউড" বইতে টুং হুই হু উল্লেখ করেছেন যে, আমাদের ডেটা কোনও বিমূর্ত ক্লাউডে জাদুকরিভাবে হারিয়ে যায় না; বরং, তা শারীরিকভাবে ডেটা সেন্টারে সংরক্ষণ করা হয়। পরিবেশবান্ধব হওয়া তো দূরে, এই ডেটা সেন্টারগুলো বিশাল পরিমাণে শক্তি (পানি এবং বিদ্যুৎ) ব্যবহার করে এবং অনেক জমি দখল করে থাকে। কারেন হাও – এর তদন্তে দেখা গেছে যে মাইক্রোসফট AIকে জলবায়ু উদ্ভাবনের জন্য ব্যবহার করার মাধ্যম হিসেবে প্রচার করে, কিন্তু একই সাথে তারা ফসিল ফুয়েল শিল্পকে সহায়তা করে এমন প্রযুক্তিও সরবরাহ করে। অর্থাৎ, AI প্রযুক্তির উন্নয়ন ও ব্যবহার পরিবেশের উপর এমন বিভিন্নভাবে প্রভাব ফেলে যেদিকে আমাদের এই মুহূর্তে নজর দেয়া উচিত।

আমাদের AI আইন তৈরি করতে এবং পরিবেশ রক্ষা করতে যেসব আইন পড়তে পারি, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এনভাইরন্মেন্টাল ইমপ্যাক্টস এক্ট ২০২৪ এবং ইইউ AI এক্ট। যদিও এই আইনগুলো আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হতে পারে, তবে এতে বাংলাদেশের জনগণের নিজেদের প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনা করে এবং জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগণের জ্ঞান এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের দ্বারা তৈরী কৌশলগুলি অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। বাংলাদেশে এই বিষয়ে কাজ করা আদিবাসী সম্প্রদায়, সংখ্যালঘু গোষ্ঠী, একাডেমিক, এনজিও, এবং প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্বয়ংক্রিয় মিথ্যা তথ্য/বিভ্রান্তিমূলক তথ্য

ছাত্র আন্দোলন এবং শেখ হাসিনার বাংলাদেশ ত্যাগের পরবর্তী দিনগুলিতে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে বিভিন্ন ধরনের প্রচারণা ছড়িয়ে পড়েছিল। এই অশান্ত ও অনিশ্চয়তার সময়ে বাংলাদেশে কয়েকটি গোষ্ঠী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর সহিংসতা প্রয়োগ করে। এর ফলে ভারতের কিছু কট্টরপন্থী সমর্থকরা বাংলাদেশের ঘটনাগুলির ভুয়া ছবি এবং ভিডিও তৈরি বা প্রচার শুরু করে। অতীতের ঘটনাগুলি থেকে সংগ্রহ করা বা পরিবর্তিত ছবি ও ভিডিও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের নিজস্ব এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহার করে বিভ্রান্তি ছড়ায়, যা বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। মিথ্যা তথ্য/বিভ্রান্তিমূলক তথ্য নতুন কিছু নয়, তবে জেনারেটিভ AI নতুন ধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি করতে পারে।

জেনারেটিভ AI-এর ব্যবহার এবং এর সহজলভ্যতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ডিজিটাল ছবি ও ভিডিওগুলো সহজে বিকৃত করা সম্ভব হচ্ছে, যার ফলে মিথ্যা তথ্য ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ছড়ানোর ঝুঁকি বাড়ছে। আজ আমরা যেসব বড় ধরনের ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছি তার মধ্যে একটি হলো ডিপফেইকস। কারেন হাও (Hao 2021) এর সংজ্ঞা মতে ডিপফেইকস বলতে "AI দ্বারা তৈরি এবং বিকৃত মিডিয়া"কে বোঝায়। তার নিবন্ধ "আ হরিফায়িং নিউ AI এপ সোয়াপস উইমেন ইনটু পর্ণ ভিডিয়োস উইথ আ ক্লিক" এ হাও ব্যাখ্যা করেছেন যে কিভাবে যে কেউ সহজেই ডিপফেইকস তৈরি করতে পারে, যা নতুনভাবে প্রতিশোধমূলক পর্ন তৈরি করার পথ খুলে দেয় এবং এর ফলে নারীদের আরও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় ফেলে দেয়। বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি এনজিও প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যে কীভাবে নারীদের ব্যক্তিগত ছবি প্রাক্তন সঙ্গীদের দ্বারা অনলাইনে ফাঁস করা হয়, যার ফলে নারীরা অনলাইন এবং অফলাইন উভয় জায়গায় হয়রানির শিকার হন, যা অনেক ক্ষেত্রে তাদের আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অফ গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (BIGD) একটি গবেষণাপত্রে মাহপারা উল্লেখ করেছেন যে নারীদের ছবি পর্ণোগ্রাফিক চিত্রে রূপান্তরিত করার কিছু উদাহরণ ইতিমধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। এখন ডিপফেইকের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বাইরেও প্রতিশোধমূলক পর্ন ভিডিও তৈরি করা সম্ভব। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে সংগ্রহ করা ছবির ভিত্তিতে এই ধরনের ভিডিও তৈরি করা যায়, এবং শুধুমাত্র মুখের ছবি ব্যবহার করেও ভিডিও তৈরি করা সম্ভব হয়। এই ভিডিওগুলো এতটাই "বাস্তব" বলে মনে হয় যে এগুলো ব্যবহার করে নারীদের ব্ল্যাকমেইল করা ও সামাজিকভাবে হেয় করা সহজ।

ভালো ডিপফেইক শনাক্তকারী প্রযুক্তি এখনও ব্যাপকভাবে সহজলভ্য নয়, এবং এই ধরনের ভিডিওগুলি প্রকাশ্যে বা অর্ধ-ব্যাক্তিগত মাধ্যম যেমন হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে তা নারীদের জন্য বিশেষভাবে ক্ষতিকর, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে। এমনকি যদি আদালতে প্রমাণিত হয় যে ডিপফেইক ভিডিওগুলো মিথ্যা, তবুও বাংলাদেশ এবং বৃহত্তর দক্ষিণ এশিয়ায় অতীতে দেখা গেছে যে এসব ঘটনায় গণহিংসার ঘটনা আকস্মিকভাবে ঘটে যায়। ডিপফেইকের মাধ্যমে নারীদের বা কুইয়ার সম্প্রদায়কে জড়িত করে তৈরি করা ভিডিওগুলো প্রমাণের আগেই ক্ষতি বা মৃত্যুর কারণ হতে পারে (হোক তা হত্যা বা আত্মহত্যা)। বাংলাদেশের AI আইনে অবশ্যই মানুষকে এই ধরনের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে এবং দায়ী ব্যক্তিদের জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। যেহেতু AI ধীরে ধীরে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একীভূত হচ্ছে, তাই আমি আশা করি যে বাংলাদেশের আইন এবং নীতির উন্নয়নে একটি গঠনমূলক সংলাপ তৈরি হবে। আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে, আমাদের কাছে এমন (আইনি) সরঞ্জাম এবং সামাজিক সচেতনতা রয়েছে যা আমাদের সংখ্যালঘু এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হওয়া মিথ্যা তথ্য ও বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করতে সহায়ক হবে।

সামনে এগিয়ে যাওয়াঃ সংশোধনের সুপারিশমালা

AI সিস্টেম এর মাধ্যমে বৈষম্যমূলক আচরণের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার বিষয়ে বিশ্বের অনেক দেশই এখন আলোচনা করছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ AI সিস্টেম ব্যর্থ হলে বা কোন ব্যক্তি ও সমাজ ক্ষতির সম্মুখীন হলে তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার গুরুত্বের বিষয়ে একমত পোষণ করেছে। একটি প্রায়শ আলোচিত আইন হলো ইউরোপীয় ইউনিয়নের জেনারেল ডেটা প্রটেকশন রেগুলেশন (GDPR) এর ২২ ধারা, যা স্বয়ংক্রিয় সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সীমিত করে: "ডেটা অধিকারীর শুধুমাত্র স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে তৈরি এমন সিদ্ধান্ত, যার আইনী প্রভাব রয়েছে, এমন সিদ্ধান্তের নিয়ন্ত্রনাধীন না হওয়ার অধিকার রয়েছে।" এই আইনটি সম্প্রতি ইউরোপের একটি মামলায় ব্যবহার করা হয়েছিল, যেখানে উবার এবং ওলা-র ড্রাইভাররা তাদের তথ্যে প্রবেশাধিকার দাবি করেছিলেন এবং AI দ্বারা তাদের বরখাস্ত করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার চেয়েছিলেন। নেদারল্যান্ডসের আপিল আদালত গিগ কর্মীদের পক্ষে GDPR এর ২২ ধারা প্রয়োগ করে রায় দিয়েছিলেন।

যদিও এই আইনটি সমসাময়িক সময়ে বিপ্লবী, তবুও এর উন্নতির সুযোগ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, এই আইন মানুষকে শুধুমাত্র "স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়াজাতকরণের উপর ভিত্তি করে তৈরি" সিদ্ধান্ত থেকে রক্ষা করে, তবে যদি কোনও সিদ্ধান্ত আংশিকভাবে স্বয়ংক্রিয়তা এবং আংশিকভাবে মানুষের দ্বারা গৃহীত হয় তবে কী হবে? এই ক্ষেত্রে একটি ফাঁক থেকে যায়, যেখানে কোম্পানিগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বয়ংক্রিয়তা এবং মানুষের ভূমিকা দুটো বিষয় প্রমাণের মাধ্যমে নিজেদের রক্ষা করতে পারে। আমাদের AI নীতিমালায় এই ফাঁকটি মোকাবেলার সুযোগ রয়েছে। GDPR-এর ২২ ধারা শুধুমাত্র "আইনি প্রভাব" আছে এমন স্বয়ংক্রিয় সিদ্ধান্তের উপর বেশি গুরুত্বারোপ করে; কিন্তু এমন বৈষম্যমূলক আচরণ, যা আইনি প্রভাব ফেলে না, সেগুলোর প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ প্রয়োজন। যদি বাংলাদেশের AI আইন ও নীতিমালা এই ফাঁকগুলো মোকাবেলা করতে পারে, তবে আমরা কেবল আমাদের দেশের মানুষকে স্বয়ংক্রিয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষতি থেকে রক্ষাই নয়, বরং অন্য দেশগুলোর জন্যও একটি দৃষ্টান্ত প্রদান করতে পারব।

আমাদের AI আইন প্রণয়নের জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয় হল ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদ্য মার্চ ২০২৪ সালে প্রকাশিত আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এক্ট। এই আইনের ধারা ৫: নিষিদ্ধ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অনুশীলন এর লক্ষ্য হল মানুষকে বৈষম্যমূলক AI প্রথা থেকে রক্ষা করা হয় এবং এটি অনেকভাবে এলগরিদমিক পক্ষপাত থেকে মানুষকে সুরক্ষিত রাখতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, পূর্বে উল্লেখিত AI দ্বারা বৈষম্যমূলক নিয়োগ বা বরখাস্ত প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়নের AI এক্ট নিম্নলিখিত সুরক্ষা ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করেছে:

"(খ) বাজারে স্থাপন, পরিষেবায় স্থাপন বা একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থার ব্যবহার যা একজন স্বাভাবিক ব্যক্তি বা একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বয়স, কোন অক্ষমতা বা একটি নির্দিষ্ট সামাজিক বা অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সৃষ্ট দুর্বলতাকে কাজে লাগায়, যার উদ্দেশ্য বা প্রভাব সেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আচরণকে বিকৃত করে এবং এর ফলে উল্লেখযোগ্য ক্ষতি সৃষ্টি করে বা তা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।"

এই আইনটি মানুষকে তাদের অনুমতি ছাড়াই তাদের চেহারার ছবি সংগ্রহ করে ফেসিয়াল রিকগনিশন টেকনোলোজি (FRT) প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত হওয়া থেকেও রক্ষা করে, পাশাপাশি এটি স্বয়ংক্রিয় পূর্বাভাসমূলক পুলিশিং এবং ব্যাপক নজরদারি থেকে রক্ষা করে, যা বিস্তর গবেষণায় উঠে এসেছে যে প্রায়ই সংখ্যালঘু এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বৈষম্য সৃষ্টি করে।

আমি কোনোভাবেই "পশ্চিমা" আইন অনুসরণ বা গ্রহণ করার পক্ষে মত দিচ্ছি না। আমরা এখনো আমাদের বর্তমান আইনি ব্যবস্থায় উপনিবেশিক আইনের যে শিকড় রয়েছে তার মূল্য দিচ্ছি। অন্যান্য দেশের AI আইন আমাদের সম্ভাব্য সমস্যাগুলি খুঁজে বের করতে এবং অন্যান্য দেশগুলো কিভাবে নতুন নতুন অ্যালগরিদমিক প্রযুক্তি থেকে জনগণকে সুরক্ষিত রাখার বিষয়ে চিন্তা করছে তা বুঝতে সাহায্য করতে পারে। তবে AI সিস্টেমগুলি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যে বিশেষ সমস্যাগুলি তৈরি করতে পারে, সেগুলোর দিকেও মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। পূর্বে উল্লিখিত বিবাহ/বিচ্ছেদের উদাহরণটি কেন আমাদের

নিজেদের সংস্কৃতি এবং অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে AI নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইন প্রয়োজন তা নির্দেশ করে। এটি বাংলাদেশের সব শ্রেণীর মানুষের জন্য একটি আহ্বান যেন আমরা সম্মিলিতভাবে চিন্তা করতে পারি যে এই সিস্টেমগুলি কীভাবে আমাদের, আমাদের প্রিয়জনদের এবং আমাদের সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করতে পারে।

শেষকথা

স্মার্ট বাংলাদেশ ভিশন ২০৪১ মূলত রোবোটিক্স এবং স্বয়ংক্রিয়তা বাড়ানোর উপর গুরুত্ব দেয়। আমাদের এই বিষয়গুলো সম্পর্কে চিন্তা শুরু করা উচিত, কারণ আইন গৃহীত হওয়ার পর সেগুলো সংশোধন করা কঠিন। আমরা ২০২২ সালে ডিজিটাল প্রমাণ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের পরিবর্তন করেছি। আমাদের পূর্বপরিকল্পনা করতে হবে এবং মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য যতটা সম্ভব এখন থেকেই কাজ করতে হবে। আমি একজন প্রযুক্তি-বিরোধী নই যে উদীয়মান প্রযুক্তিগুলোকে প্রত্যাখ্যান করি। আমি স্বীকার করি যে এগুলো স্বাস্থ্যসেবার মতো বিভিন্ন উদ্দেশ্যে অর্থপূর্ণভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ক্যান্সারের গবেষকরা চিকিৎসা ডেটাবেস থেকে তথ্য বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে প্যাটার্ন এবং পরিবর্তনগুলি চিহ্নিত করে পূর্বাভাস নির্ধারণ কৌশল ব্যবহার করে প্রাথমিক স্তরের ক্যান্সার সনাক্ত করতে এবং ওষুধ উন্নয়ন করতে সহায়তা করে। এখানে লক্ষ্য করতে হবে যে, HCI, STS, এবং মিডিয়া স্টাডিজের গবেষকরা বলেছেন যে এই ডাটাবেসগুলি সাধারণত অশ্বেতাঙ্গ মানুষের তথ্যের অভাব বা পক্ষপাতিত্বের কারণে বিকৃত হতে পারে, যা এই গোষ্ঠীগুলোর জন্য ত্রুটিপূর্ণ ফলাফল তৈরি করতে পারে। আমি AI এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির বিরুদ্ধে নই, বরং মনে করি তাদের নকশা ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে ত্রুটিগুলো তুলে ধরা গুরুত্বপূর্ণ।

আমার এই লেখার পেছনে তিনটি প্রধান কারণ রয়েছে। প্রথমত, আমি AI-কে সহজবোধ্য করতে চাই এবং এই সিস্টেমগুলির ব্যবহার থেকে সামাজিক-প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে ত্রুটিগুলি ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করতে চাই। আমার লক্ষ্য হল AI সিস্টেমগুলি যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখা হয় তাহলে সমাজে কি ধরণের ক্ষতি হতে পারে তা চিহ্নিত করা। দ্বিতীয়ত, আমি বাংলাদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের (সাংবাদিক, নারীবাদী ও মানবাধিকার কর্মী, আইনজীবী, একাডেমিক, উদ্যোক্তা, সরকারি কর্মকর্তা, শিল্পী, কম্পিউটার বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, হিজড়া সম্প্রদায়, মুসলিম ও অ-মুসলিম সংখ্যালঘু গোষ্ঠী, আদিবাসী গোষ্ঠী, রোহিঙ্গা শরণার্থী, ইত্যাদি) সঙ্গে আলোচনা এবং সংলাপের সুজোগ তৈরি করতে চাই যাতে আমরা একে অপরের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মতবিনিময় করতে পারি এবং শিখতে পারি। সমাজে AI-এর অন্তর্ভুক্তির জন্য এবং এর ক্ষতি হ্রাস করতে আমাদের একসাথে কাজ করা এবং সমষ্টিগতভাবে চিন্তা করা গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয়ত, এটি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার এবং পরবর্তী সরকারকে এই অভাবগুলো দূর করার এবং AI এবং অন্যান্য ডিজিটাল আইনগুলির নিয়ন্ত্রণ সমর্থন করার আহ্বান যেন এগুলো দেশের মানুষের মঙ্গল কেন্দ্রে রেখে তাদের স্থানীয় বা বৈশ্বিক ক্ষমতার প্রভাব থেকে রক্ষা করতে পারে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বিশেষ ধন্যবাদ ব্যারিস্টার সারা হোসেনকে তাঁর পরামর্শ এবং দিকনির্দেশনার জন্য, এবং বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এর সহকর্মীদের যারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন। এছাড়াও, আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই আমার দীর্ঘমেয়াদী ব্লাস্টের প্রাক্তন সহকর্মী ইসরাত জাহান সিদ্দিকী-কে এই প্রবন্ধটি বাংলায় অনুবাদ করার জন্য এবং সাবহানাজ রশিদ দিয়া কে এই নিবন্ধটি প্রকাশে সাহায্য করার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।